

শিকড়ের সন্ধান- প্রেক্ষিত জঞ্জীবাদ

(মুন্সী কেফায়েতুল্লাহ)

গত শুক্ৰবার (২০-০৩-২০০৭) দৈনিক জনকণ্ঠে মামুনুর রশীদেৰ “জঞ্জীবাদেৰ শিকড় কোথায়” শীৰ্ষক একটি লেখা প্রকাশিত হয় যাৰ সূত্ৰ ধৰেই অত্ৰ প্ৰসংগেৰ অবতাৰণা। জঞ্জীবাদ কি কোন বৃক্ষ; যদি বৃক্ষই হয় তৰে সে বৃক্ষেৰ শিকড় কোথায়? অত্যন্ত সঞ্জাত প্ৰশ্ন।

বেশ কয়েকদিন যাবত দেশেৰ সৰ্বত্ৰ জঞ্জী ধৰাৰ জোৰ অভিযান শুৰু হযেছে। শীৰ্ষ ৬ জঞ্জীৰ ফাঁসি এৰং পৰবৰ্তীতে ঝালকাঠিৰ পিপি হত্যার পর এই অভিযানে আরও গতি সঞ্চাৰ হযেছে বলে মনে হয়। জঞ্জীবাদেৰ এ্যারেষ্টি কৰাৰ সময় তােদেৰ কাছ থেকে বোমাবিস্তল জাতীয় মারণাস্ত্ৰেৰ সাথে আৰেকটি জিনিস অবধাৰিতভাবে পাওয়া যাচ্ছে-, বিভিন্ন প্ৰকাৰেৰ জেহাদী বই। সিলেটেৰ সূৰ্যাদীঘল বাড়ীতে কোন মারণাস্ত্ৰ পাওয়া যায়নি, তৰে জেহাদী বই ঠিকই পাওয়া গিয়েছিল। তৎকালীন সংবাদ পত্ৰেৰ রিপোর্ট অনুযায়ী উক্ত বইগুলি সিজার লিফ্টি অন্তৰ্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ কৰেনি। কতৃপক্ষীয় কাজকৰ্ম দেখলে ধাৰণা হয়, বোমা বা পাওয়ার জেল জাতীয় পদাৰ্থেৰ ব্যাপাৰে তাৰা যতটা সিরিয়াস, নিরীহ বইগুলিৰ ব্যাপাৰে ততটা না। অথচ প্ৰকৃত প্ৰস্তাবে উক্ত বইগুলি গ্ৰেনেড বা পাওয়ার জেলেৰ চেয়েও সহস্ৰগুন বেশী ভয়ঙ্কৰ। জঞ্জীবাদেৰ শিকড় কোথায় এই প্ৰশ্নেৰ জবাব নিহিত রয়েছে উক্ত পুস্তিকাগুলিতে। কে না জানে যে শিকড়টি উপড়িয়ে ফেলতে না পাৰলে অনুকূল আবহাওয়া পেলেই জঞ্জীবৃক্ষটি আবার পূৰ্ণোদ্যমে বিকশিত হয়ে উঠবে।

এ যাবতকাল যেসব জঞ্জী ধরা পড়েছে, তােদেৰ বক্তব্য শুনলে মনে হয়- তাৰা মোটেও কোন খাৰাপ কাজ কৰছে না। ধৰ্মেৰ জন্যে রক্ত দিয়ে পৰকালে অক্ষয় স্বৰ্গ কিনছে তাৰা। মানসিকভাবে তাৰা এতটাই মটিভেটেড যে ছাড়া পেলে আবারও তথাকথিত জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে কিংবা আৰও অধিক সংখ্যক কাফেৰ হত্যা কৰতে বিন্দুমাত্ৰ দ্বিধাশ্চিত নয় তাৰা। এজন্যে জীবনটাও যদি চলে যায় পৰকালে তাৰা পাবে শাহাদাতেৰ দৰজা। তাৰা আৰও বলেছে- তােদেৰ এই কৰ্মকাণ্ডেৰ পেছনে রয়েছে স্বৰ্গীয় নিৰ্দেশ; অৰ্থাৎ কোৰাণহাদিসেৰ সাপোর্ট। তােদেৰ এই দাবী কতটুকু সত্য? যেসব জেহাদী বই জঞ্জীবাদেৰকে এসব জঘন্য কাৰ্য্যকলাপে উদ্বুদ্ধ কৰছে, কী আছে সেসব বইতে? লিখেছেই বা কাৰা? প্ৰায়শই বিভিন্ন প্ৰকাৰেৰ লেখা নিষিদ্ধ কৰেন সৰকাৰ। কিন্তু জঞ্জীবাদেৰ কাছ থেকে উদ্ভাৰকৃত কোন বই আজ পৰ্য্যন্ত নিষিদ্ধ হয়নি! কেন? যে বই একটি রাষ্ট্ৰেৰ ভিত্তিমূল কাঁপিয়ে দিতে পাৰে, নিরীহ আদমসন্তানেৰ রক্তে ভিজিয়ে দিতে পাৰে দেশেৰ মাটি, সেসব বইয়েৰ লেখক, প্ৰকাশক বা মুদ্ৰাকৰেদেৰ বিরুদ্ধে কোনপ্ৰকাৰ ব্যবস্থা গ্ৰহন কৰা হযেছে- আজ পৰ্য্যন্ত তাৰ একটিমাত্ৰ উদাহরণও খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ প্ৰকৃত সত্য হলো এই যে একটি যুদ্ধে সাধাৰণ সৈনিকেৰ চেয়ে সেনাপতিৰ দায়ভাগ অনেক বেশী। যাৰা বোমা মেৰে মানুষ হত্যা কৰেছে, সেই শায়খ রহমান বা বাংলা ভাইৰা সাধাৰণ সৈনিক মাত্ৰ। তােদেৰ কাছ থেকে যে জেহাদী বইগুলি উদ্ভাৰ কৰা হযেছিল, সেগুলিৰ লেখকৰা হচ্চেন সেনাপতি। এই সেনাপতিেদেৰ অনুপ্ৰেৰণাতেই একজন নিরীহ মানবশিশু ভয়ংকৰ জঞ্জী হিসেবে আত্মপ্ৰকাশ কৰে। সেনাপতিেদেৰকে অক্ষত রেখে কিছু চুনোপুটি সৈনিকেৰে এ্যারেষ্টি কৰে বা ফাঁসি দিয়ে যাৰা যুদ্ধ জয় কৰেচেন বলে আত্মতৃপ্তিতে ভুগেন তাৰা যে বোকাৰ স্বৰ্গে বাস কৰেচেন তাতে তোন সন্দেহ নেই।

এ প্ৰসঙ্গে আৰেকটি বিষয় বিবেচনা কৰা জৰুৰী। তুনমূল পৰ্য্যায়েৰ যেসব জেহাদীেদেৰ ধৰে সৰকাৰ জেলখানা ভৰে ফেলচেন, তােদেৰ কাৰও আৰবী ভাষা বুঝাৰ সাধি নেই। মাওলানা দেলওয়ার হোসেন সাঈদিেদেৰ মতো তথাকথিত মাওলানা সাহেবৰা কোৰাণহাদিসেৰ যে ব্যাখ্যা তােদেৰ সামনে তুলে ধৰেন, তাৰা তাই অদ্ভান্ত সত্য বলে ধৰে নিয়ে তা বাস্তবায়নে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ব্যাখ্যা ভুল না শুধু তা বিচাৰ কৰাৰ ক্ষমতা এদেৰ নেই। সিলেটেৰ আলিয়া মাদ্ৰাসাৰ মাঠে সাঈদিৰ মাজাৰ বিৰোধী তফসিৰ

মাহফিলের পরেই ঘটতে থাকে শাহ্ জালাল মাজারের আক্রমনগুলি। সুতরাং ধর্মীয় বই হিসেবে যেসব বই আমাদের সমাজে চালু আছে, তার মূল্যায়ন করা অতীব জরুরী। পাঠকের সামনে এখন একটি উদাহরণ পেশ করবো আমি। পবিত্র কোরাণের কয়েকটি আয়াত ও তার বাজার প্রচলিত ব্যাখ্যা।

সুরা বাকারা, মদীনায় অবতীর্ণ, (আয়াত ১১০-১১৫):

“আর লড়াই করো আল্লাহর পথে তাদের সাথে যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারও প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না (১১০)। আর তাদেরকে হত্যা করো যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্তুতঃ ফেৎনা-ফ্যাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকট যতক্ষণ না তারা সেখানে তোমাদের সাথে লড়াই করে, তা’হলে তাদেরকে হত্যা করো। এই হলো কাফেরদের শাস্তি (১১১)। আর তারা যদি বিরত থাকে, তা’হলে আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু (১১২)। আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো যে পর্যন্ত না ফেৎনার অবসান হয় এবং আল্লাহর ধীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর তারা যদি নিবৃত হয়ে যায়, তা’হলে কারও প্রতি কোন জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা জালেম (তাদের ব্যাপার আলাদা) (১১৩)। সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা। আর সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে। বস্তুতঃ যারা তোমাদের প্রতি জবরদস্তি করেছে, তোমরাও তাদের প্রতি জবরদস্তি করো, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে তোমাদের উপর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা পরহেজগার আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন (১১৪)। **আর ব্যয় করো আল্লাহর পথে, তবে নিজের জীবনকে স্বহস্তে ধ্বংসের সন্মুখীন করো না। আর মানুষের প্রতি দয়া করো। আল্লাহ দয়াশীলদেরকে ভালবাসেন (১১৫)।**

উপরোক্ত আয়াতগুলির সরলার্থ বুঝতে সাধারণ পাঠকেরও খুব একটা অসুবিধা হয় কি? বোধ হয় না, কারণ একজন মুসলমান কীভাবে অত্যাচারী জালেমের মোকাবেলা করবে তারই সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে আয়াতগুলিতে। বলা হয়েছে যে শক্তি দিয়েই শক্তির মোকাবিলা করতে হবে, তলোয়ারের সাথে তলোয়ার দিয়ে লড়াইতে হবে- ফুল দিয়ে নয়। রাসুলের এই নির্দেশ বর্তমান যুগেও কতটা বাস্তব এবং জীবনমুখী- আশা করি পাঠককে তা আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। আয়াতগুলিতে আরেকটি প্রচ্ছন্ন কিন্তু সুস্পষ্ট মেসেজ রয়েছে- যারা অত্যাচারী এবং সমাজে দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টিকারী শুধুমাত্র তাদের বিরুদ্ধেই লড়াই করার কথা বলা হয়েছে, সাধারণ লোকদের বিরুদ্ধে নয়। এবং কোন অবস্থাতেই সীমা লঙ্ঘন করতে কঠোরভাবে বারণ করা হয়েছে। দানশীলতা এবং শত্রুর প্রতি দয়া প্রদর্শনেরও নির্দেশ আছে আয়াতগুলিতে।

তবে মুশকিল হয়েছে যে কোরাণের প্রকৃত অর্থ বুঝা নাকি আমাদের মতো সাধারণ লোকদের পক্ষে সম্ভব নয়, সরল অর্থের পেছনে লুক্কায়িত থাকে গুরুত্বপূর্ণ অনেক মারফাতি অর্থ -যার সঠিক ব্যাখ্যার এখতিয়ার আছে কেবলমাত্র মাওলানা মওদুদী কিংবা আল্লামা আজিজুল হকদের মতো হাদিস-ফিকাহ বিশেষজ্ঞের। আম্-জনতাকে কোরাণের সঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করাতে উপরোল্লিখিত ১১৫নং আয়াতের কীরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে- তার একটা নমুনা পেশ করা গেল। মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ শাফীর (রহঃ) মা’রেফুল কোরাণের বাংলা অনুবাদ করেছেন শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুহিউদ্দিন খাঁন সাহেব। তফসির গ্রন্থটির ১০০নং পৃষ্ঠায় ১১৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এভাবেঃ-

“ওয়া লা তুল্কু বিআইদিকুম ইলা তাহ্লুকা ওয়া আহ্লিনু -(এবং নিজের জীবনকে স্বহস্তে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না) এই আয়াতাংশের শাব্দিক অর্থ অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট। এতে স্বেচ্ছায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে বারণ করা হয়েছে। এখন কথা হলো যে ‘ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা’ বলতে এখানে

কি বুঝানো হয়েছে? এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদের ব্যাখ্যাভাগের অভিমত বিভিন্নপ্রকার। ইমাম জাসাস ও ইমাম রাজী (রহঃ) বলেছেন, আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত উক্তির মাঝে কোন বিরোধ নেই। প্রত্যেকটি উক্তিই গৃহিত হতে পারে। হযরত আবু আইয়ুব আনসারি (রাঃ) বলেন এই আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাজেল হয়েছে। আমরা এর ব্যাখ্যা উত্তম রূপেই জানি। কথা হলো এই যে, আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে যখন বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো যে এখন আর জিহাদের কি প্রয়োজন? এখন আমরা আপন গৃহে অবস্থান করে বিষয় সম্পত্তির দেখাশোনা করি। এই প্রসঙ্গেই আয়াতটি নাজেল হলো। এতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে ‘ধ্বংসের’ দ্বারা এখানে জেহাদ পরিত্যাগ করাকেই বুঝানো হয়েছে। এতদ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, জেহাদ পরিত্যাগ করা মুসলমানদের জন্যে ধ্বংসেরই কারণ। সে জন্যেই হযরত আবু আইয়ুব আনসারি (রাঃ) সারা জীবনই জেহাদ করে গেছেন। শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুলে শহীদ হয়ে সেখানেই সমাহিত হয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হুযায়ফা (রাঃ), ক্বাতাদা (রাঃ) এবং মুজাহিদ ও যাহ্বাক (রাঃ) প্রমুখ তফসির শাস্ত্রের ইমামগণের কাছ থেকেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে।”

বুঝুন ঠেলা! সহজ সরল সুন্দর কতগুলি আয়াতকে গোটাকয়েক রাতিয়াল্লাহ্ আর রাহমাতিল্লাহ্’র বরাত দিয়ে কী রকম জটিল ও প্রাণঘাতী করে তোলা হলো। আল্লাহ বলেছেন যে ‘তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো, নিজের জীবনকে নিজের হাতে ধ্বংস করে ফেলো না। মানুষের প্রতি দয়া করো, আল্লাহ দয়াশীলদের ভালবাসেন’। অর্থাৎ সম্পদশালী লোক তার সম্পদ যেন মানুষের কল্যাণে ব্যয় করে, যেন সেই সম্পদের অপব্যবহার করে নিজের জীবনকে ধ্বংস করে না ফেলে- আয়াতগুলির সরলার্থে এরূপই হওয়ার কথা। কে না জানে যে অর্থই সকল অনর্থের মূল। অর্থের অভাবে কেউ একবেলা খাবার পায় না, আবার কেউ মদ-জুয়া-নারী-বাড়ী-গাড়ির পেছনে খরচ করে জীবনটাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। এই সহজ সুন্দর আয়াতগুলির মধ্যে জেহাদ কী করে ঢুকে পড়ল পাঠক! শুধু জেহাদ নয়, আজীবন জেহাদ। দেশ থেকে দেশান্তরে। কারণ উক্ত আয়াতের অনুপ্রেরণাতেই আনসারি (রাঃ) সাহেব দেশ হতে দেশান্তরে জেহাদে নেমেছেন এবং জাজিরাতুল আরবের সীমানা পেরিয়ে সুদূর ইউরোপের প্রান্ত নগরী ইস্তাম্বুল নগরীতে যেয়ে জেহাদ করতে করতে শহীদ হয়েছেন। মাওলানা সাহেবদের এই তফসির ফলো করতে যেয়ে যদি শায়খ রহমান, বাংলা ভাই, মুফতি হান্নানরা আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া বা বাংলাদেশে যেয়ে জেহাদে শরীক হয় বা ছেলেদেরকে শাহাদত বরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে, তাহলে আর তাদের দোষ দিয়ে লাভ কি? মাননীয় তফসিরকারদের ব্যাখ্যা মোতাবেক ঘরে বসে থাকার উপায় নেই। দেশ থেকে দেশান্তরে জেহাদ করে যেতেই হবে। একটা শেষ হলে আরেকটা, কারণ খোদার দুনিয়ায় কাফের-মুশরেকের তো আর কোন অভাব নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবী নামক গ্রহটির বাশিন্দাদের মধ্যে পাঁচ ভাগের চার ভাগই হচ্ছে কাফের-মুশরেক। সুতরাং মাওলানা সাহেবের বিধান মোতাবেক দুনিয়াটাকে এক অন্তর্হীন যুদ্ধক্ষেত্র আর রক্তপাতস্থলে পরিণত করে ফেলা ছাড়া আর কোন উপায় আছে!

এমতবস্থায় বিক্ষিপ্তভাবে গোটাকয়েক জঞ্জালী পাকড়াও করলেই দেশ হতে জঞ্জালীবাদ উচ্ছেদ হয়ে যাবে বলে যারা ভাবছেন- আবারও বলছি তারা মুর্থের স্বর্গে বাস করছেন। পবিত্র গ্রন্থগুলির যেসব ভ্রান্ত ও মনগড়া ব্যাখ্যা যুগের পর যুগ প্রতিবাহিত হয়ে সমাজকে কেবলমাত্র পেছনের দিকে ঠেলে দিয়েছে, সেইসব ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে নূতন প্রজন্মের আলোকে তার ব্যাখ্যার ব্যবস্থা করা অতীব জরুরী। আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে একটি প্রিমিটিভ সোসাইটিতে একজন মহামানব এসেছিলেন একটি ফিলসফি নিয়ে, প্রাগ্রসরতার ফিলসফি। আমরা তার ফিলসফিকে অনুধাবন না করে তার দৈনন্দিন খুঁটিনাটিকেই মুখ্য করে নিয়েছি, যে খুঁটিনাটি সম্পাদিত হয়েছিল স্থানকালের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে। দেড় হাজার বছরে বিশ্ব অনেক বদলেছে, পরিবর্তন হয়েছে সমাজের। নূতন দিনের আলোকে নিত্য

নতুন চাহিদার প্রেক্ষিতে নুতনভাবে আবিষ্কার করতে হবে সেই ফিলসফিকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নবীর যুগে দাসপ্রথা ছিল সর্ব সমাজে প্রতিপালনীয় একটি প্রথা। ইহুদি, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ প্রতিটি সমাজেই এই কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। যথারীতি আরব দেশেও ছিল। রাসুল এই প্রথা উচ্ছেদ করে যাননি, পালন করেছেন। কিন্তু দাসপ্রথার ভেতর যে অমানবিক ট্রাজেডি লুক্কায়িত আছে, তা অনুভব করেছেন তিনি। তাই দেখা যায়, দাসমুক্তিকে তিনি সর্বোচ্চ পুণ্যকর্ম বলে বিধান দিয়ে গিয়েছেন, দাসমুক্তির বদলে রোজা রাখার মতো অবশ্যকরণীয় ধর্মীয় প্রতিপাল্যকেও রেয়াত দিয়েছেন। দাসকে মুক্ত করে তাকে মুসলমানদের সেনাপতি বানিয়েছেন। অর্থাৎ- দাসপ্রথাকে রহিত না করলেও রাসুলের স্পিরিট ছিল সুস্পষ্টভাবে দাসপ্রথার বিরুদ্ধচারী। সমাজ বিবর্তনের ধারায় প্রাতিষ্ঠানিক দাসপ্রথা এখন আর প্রচলিত নেই। কালের অনিবার্যতায় নবীর গুটিকয়েক দাসদাসী ছিল, তাই সুনুতের দোহাই দিয়ে কোন মাওলানা যদি একবিংশ শতাব্দীতে বসে দাসপ্রথাকে ইসলামসম্মত বলে ফতোয়া দেন, তবে বলতে হবে যে তিনি নবীর ফিলসফিকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ঠিক অনুরূপভাবে, সারভাইব করার খাতিরে বহু যুদ্ধ করতে হয়েছে নবীকে। সেইসব যুদ্ধে সৈন্যদেরকে অনুপ্রেরণা দিতে শত্রুহত্যার বাণী দিতে হয়েছে তাকে যা ছিল একান্তভাবেই অবস্থাকেন্দ্রিক। তিনি যখন মক্কায় ছিলেন তখন ‘ক্বিতাল’ বা যুদ্ধের কথা বলেননি। মদীনায় হিবরত করার পর যখন একটি রাষ্ট্র স্থাপন করলেন এবং নবীর উর্দীর উপর রাজার উর্দি চাপালেন, তখন প্রয়োজনের খাতিরেই সশস্ত্র যুদ্ধের বাণী দিতে হয়েছে তাকে। সুতরাং তার এই বাণীগুলিকে সেই সময়ের পরিস্থিতির আলোকেই বিবেচনা করতে হবে। তার সেই বাণীকে মূলধন করে কেউ যদি একবিংশ শতাব্দীতে বসে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে অনন্তকাল ধরে জেহাদ পরিচালনার ডাক দেন, তবে বলতে হবে যে তিনি নবীর ফিলসফি অনুধাবন করতে পারেননি।

জঙ্গীবাদকে সমাজ হতে দূরীভূত করতে হলে ধর্মগ্রন্থের প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলির পুণনিরীক্ষন অতীব জরুরী। জঙ্গীবাদের শিকড় যদি কোথাও নিহিত থাকে- তবে এইখানে। ‘আমরা সবাই তালেবান, বাংলা হবে আফগান’- এই শ্লোগানের প্রবক্তারা যদি কোরাণহাদিসের ব্যাখ্যা নিয়ে আসে তবে তার অবধারিত প্রডাক্ট হিসেবে আবির্ভূত হবে বিচারক হত্যাকারী মামুনেরা। কিছু লোককে এ্যারেস্ট করে এর সাময়িক প্রশমন হয়তো সম্ভব, তবে মাদ্রাসাগুলিতে যে পর্যন্ত তালেবান নেতাদের দ্বারা লিখিত বা অনুদিত বইসমূহ বহাল থাকবে এবং কোমলমতি শিশু কিশোররা সেই তালেবান-মার্কী ব্যাখ্যা মগজে ঢুকিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে- তারা অবশ্যই সন্ত্রাসকে ঐশী নির্দেশ মনে করে মানুষ হত্যাকে পবিত্র কাজ বলে মনে করবে। এ বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

তাং-২১শে এপ্রিল, ২০০৭।

ই-মেইল: kfmunshi@yahoo.com